শব্দ যুদ্ধ

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

কতটা তিনি বিখ্যাত বা জনপ্রিয় বা আদৌ তিনি প্রতিবাদী নাকি জনস্বার্থ বিরোধী অথবা অমানবিক বা প্রগতিশীল লেখক -এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে। তবে তর্কের একটা দোষ তর্ক চলতে তর্ক থামে না। ফলে তর্কের খাতিরে জনপ্রিয়তাটা বেড়ে যায় এবং জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়। এই 'তিনি' লোকটাই হচ্ছেন তমোনাশ চক্রবর্তী, দক্ষিণ কলকাতার চারতলার নিজের ফ্লাটে বসবাস করেন। একদল সম ালোচকের মতো তিনি বাহারি অশ্লীল লেখক পণ্য মূল্যে সাহিত্য বিক্রি করেন। আরেকদল সমালোচক বলেন, প্রগতিশীল মানবিক সা হিত্যিক । এই আরেকদল সমালোচকরা সবাই, সবাই নয় বেশির ভাগ তমোনাশবাবু যে দৈনিক পত্রিকা অফিসে কাজ করেন এবং লেখেন, সেই অফিসের।

এই বিখ্যাত, প্রগতিশীল, জনস্বার্থ বিরোধী কথা-সাহিত্যিক তমোনাশ- বাবুর মস্তিষ্কের ভেতর 'মানবিক' ও 'প্রগতি'শব্দ দুটি এখন পাক খাচ্ছে। ঘটনাটা টানছে তমোনাশবাবুকে। 'আজ আমরা স্বনামধন্য মহান কথা সাহিত্যিক তমোনাশ চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানিয়ে গৌরববোধ করছি। তিনি একজন মানবিক এবং প্রগতিশীল কথা-সাহিত্যিক', এবং এভাবেই শব্দের পর শব্দ সাজানো হয়েছে ম ানপত্রে । এটাই ঘটনা, মানপত্রে চারশ শব্দের মধ্যে আড়াইশ শব্দই হচ্ছে 'মানবিক' এবং 'প্রগতি'। আর তখন থেকেই ঐ দুটি শব্দ তমোনাশবাবুকে হন্ট করছে। ছারপোকা কিম্বা মশা কিম্বা মাছি ইত্যাদি কীটপতঙ্গের মতো এই কথা-সাহিত্যিক কে বিব্রত করছে। সংবর্ধনা সভা থেকে ফিরে এসে তিনি দেখেন ঘরটা অন্ধকার, লোডশডিং। রাত নটা পেরিয়ে এগোচ্ছে। চোখ দুটো খোলাই আছে, ম াঝে বুজে আসছে।চোখের সামনে ভেসে ওঠা শব্দ দুটির ঝগড়া তিনি এখন দেখছেন । দেখছেন মানবিক বিদ্রুপাত্মক ছড়া কাটছে ঃ ছিঃ প্রগতি ছিঃ। এরপর প্রগতির মাথায় পরের লাইনটি আসে, 'তোর নামে খাচ্ছে ঘি।'

'তবে রে' বলেই মানবিক কবির লড়াই এর মতোই পাল্টা শোনায়---'শোন প্রগতি। এতোর নাই কোন গতি।' এভাবেই শব্দের লড়াই বেঁধে যায়। আর তখনি তমোনাশবাবু বাবু দুটোর ভেতর থেকে বের হয়ে এসে সৌখিন খাট থেকে নেমে, দামি আলমারি খুলে মদ ও সোড়ার বোতল বের করে, প্রবর্তক ফার্নিচার থেকে কেনা গদি আঁটা সোফায় বসে মদ্যপান শু করেন। কিছুক্ষ ণ পর চোখ বুজে অ াসতেই দেখতে পান প্রগতি মানবিক-কে একটা ঘুসি মারতেই মানবিকের শরীর থেকে 'ক'বর্নটি খসে পড়ে 'মানবি' হয়ে যায়। এই হিংস্রতা সহ্য করতে না পেরে তিনি সামান্য টলায়মান অবস্থাতেই গোদরেজ কোম্পানির বড় সাইজের হটার থেকে ফিস্‌ফ্রাই বের করে আনতে পারেন এবং পুনরায় এসে সোফায় বসেন। এরপর হঠাৎ তমোনাশ-বাবুর মুখে 'অ' শব্দটা কয়েকবার উচচারিত হয়। ক ারণ মানবিকের 'মানবি' হয়ে যাওয়াটা অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত হওয়াটা তিনি সহ্য করতে পারছেন না। এর উপর তাকে দেখতে হচ্ছে ধর্ষণের দৃশ্য। প্রগতি মানবিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং মানবিকে তিনটি অক্ষর দিয়ে জাপটে ধরেছে। তিনি ধর্ষণের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে ম্লান হাসেন। তারও একটা 'কারন' আছে। কারণ, এ যেন তার রচিত অনেক ছোটগল্প ও উপন্যাসেরই ধর্ষণ-দৃশ্য । মনে পড়ে 'জাতক' নামে বিখ্যাত ছোটগল্পের শেষ অংশটি, খাবার চুরি করবার জন্য ক্ষুধার্ত হরিশ রান্নাঘরে ঢুকলো । খাবার খুঁজতে দেখতে পেল এক গামলা জলঢালা পান্তা ভাত। ক্ষুধার অন্ধকারে ভেসে ওঠা হরিশের চোখদুটো আনন্দে চিক্ চিক করছে। গামলাটার সামনে খেতে বসতে গিয়ে হরিশ শুনতে পায় 'কে রে মিনসে?' হরিশ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ময়লা চাদরের ভেতর থেকে একটা বিশাল চেহারার মেয়েছেলে, বেরিয়ে পড়েছে মাই বের করে। মনে হয় বাবুদের বাড়ির কাজের মেয়েছেলে। হরিশ উত্তর দেয়, 'চেঁ'চাস নি মাইরি'। তিনদিন খাই নি (আসলে একদিন)। আজ খেতে না পারলে মারা যাব নিঘ্যাত্। দয়া কর মাইরি।দয় া হয় দয়াবতীর। বলে জোয়ান হলে দয়া করবো শুড্ডা হলে চে'চাব। বলেই হরিশের কাছে মাই ঢেকে এগিয়েযায়--'দাড়ি কামাস নি বটে । তবে তুই জোয়ান । পারবি খেতে এক গামলা ভাত' ? হরিশ বুঝতে পারে, রসিক বটেএ মেয়েছেলেটি। 'বলে, দেখ তুই, ঠিক পারবো। তবে এট্টু নুন আর কাঁচা লঙ্কা চাই যে।' দয়াবতী বেশ নজর দিয়ে দেখে মিনসের লম্বা চওড়া শরীরটা খেতে না পেয়ে দুর্বল । আর তখনই, পুষ মানুষের ঐ শরীটাকে কেমন যেন নিজের বলে দয়াবতীর মনে হয়। শুধু নুন আর লঙ্কা নয়, সাথে আচারও বেশ খানিকটা নিয়ে এসে হরিশের কাছে বসে বলে,' 'নো, খা, তিপ্‌তি করে খা আমি বাইরেটা দেখছি। ভয় নেই তোর।'

পাঁচমিনিটও লাগে না হরিশের এক গামলা জলঢালা পান্তা খেতে। তলার ভাত-মাখা - জল গামলাটা মুখের কাছে এনে নেয়। হাত মুখ ধোয়। দয়াবতী, শাড়ির আচঁলটা দিয়ে বলে---'হাত মুখ মুছে ফেল।' দয়াবতীর মুখের দিকেতাকিয়ে বলে হরিশ ---'এবার য াই!' মুখে হাসি থাকা সত্ত্বেও গলায় কঠোরতা এনে দয়াবতী বলে---'যাবি কি রে মিনসে। আমার পাশে শুতে ইচ্ছে করছে না। আয় বলছি।' বলেই আলো নিভিয়ে দিয়ে হরিশের হাত ধরে ময়লা বিছানায় নিয়ে যায়। ঘরের দরজা বন্ধ করতেই জানলা দিয়ে চাঁদের আলো হরিশের নজরে আসে। ময়লা বিছানায় চাঁদের আলো চ াদরের মত পড়ে আছে ! হরিশ বলে, ---জানলাটা বন্ধ করি।' দয় াবতী উত্তর দেয় --'না থাক।' বলেই হরিশকে জাপটে ধরে কাছে টেনে নেয়।

মানবির উপর প্রগতির ধর্ষণ দেখে তমোনাশবুবার মতো লেখকদের সাময়িকভাবে লজ্জা হয়। কারণ হরিশের উপর দয়াবতীর উগ্র না হোক নরম ধর্ষণ বলা যেতে পারে। আমাদের দেশের বোকা পাঠক বা অবচেতন মনে সূড়সূড়ি -খাওয়া পাঠক ওসব বুঝবে না। বুঝবে আহা হরিশ খেতে পায় না গো। তাকে অন্ন চুরি করতে হয়। আমাদের দেশে কবে পরিবর্তন আসবে। দয়াবতীর মতো মেয়েরা আছে বলেই তো হরিশের মতো লোকেরা সংবর্ধনা পান, আমাদের বাঙলা সাহিত্যে প্রগতি - নক্ষত্র এই তমোনাশ চত্রবর্তীকে জান াই আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন। তিনি একদিকে রোমান্টিক কথাসাহিত্যিক, অপর দিকে সংগ্রামী এবং মানবিক কথাসাহিত্যিক । তিনি প্রগতিশীল লেখকদের প্রগতিশীল লেখক ...'

ঃ কিন্তু তমোনাশ বাবু একটা কথা বলি দয়াবতী তো বিধারার শারীরিক কামনা মেটাবার জন্য হরিশের মতো মধ্যবয়েসী যুবককে দয় া, স্নেহ, মায়া মমতা ইত্যাদি তরল সেন্টিমেন্ট ঢেলে বশ করলো। আপনি তো এটাই চেয়েছিলেন এখানেই তো আপনার চালাকি, প াঠককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা । এখানেই আপনার হিপোক্রেসি। এর জন্যই আপনার চোখে ঘুম নেই। তমোনাশবাবু, আপনিতো এক সময় বামপন্থী রাজনীতি করতেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রগতিশীল লেখক ছিলেন। আপনার চূড়ান্ত ভন্ডামীর জন্যই কি আপনার অধ্যাপিকা স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে আপনাকে ছেড়ে অন্য ফ্লাটে বসবাস করে ? এর জন্যই তো আপনার চোখের সামনে মানপত্রেরনানান রকম তৈরি শব্দরা ঝগড়া করে।

এই তো আপনার চোখের সামনেই প্রগতির দ্বারা ধর্ষিত মানবি অজ্ঞান হয়ে গেল। অজ্ঞান হওয়ার আগে ধর্ষিত না হওয়ার জন্য এই মানবি যথেষ্ট প্রতিরোধ করেছিল। প্রতিরোধ করতে করতে মানবির লাথির চোটে প্রগতির শরীর থেকে 'প্র' অক্ষরটি খসে পড়েছিল। 'মানবি'-র অজ্ঞান অবস্থা দেখে শুয়ে থাকা তমোনাশবাবুর ফরসা মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত শব্দের টেস্ট-টিউবে জমতে থাকে। এই উপমাটি সঠিক অর্থে প্রয়োগ করে বলা যেতে পারে যে মুখ থেকে রক্ত সরে যাওয়াতে তমোনাশবাবুর ফরসা মুখটা পুর াতন সাদা কাগজের হলুদাভ পরিণতি লাভ করে। পরিণতি লাভ করায়, 'মানবি' আর জ্ঞান ফিরে পায় না। তমোনাশবাবু তখন 'ক' অক্ষরটাকে জুড়ে দেন, যদি জ্ঞান ফিরে আসে। আসে না। বুকের ভেতর চেপে বসা ভীষণ ভারি এই মৃত 'মানবি' শব্দটিকে বের করে আনার জন্য এখন তমোনাশবাবু তাঁর প্রিয় নার্সিং হোম ড্রিম-হেভেন -এ ফোন করেন। বলেন, 'আমার বুকে ভীষণ যন্ত্রণা। সহ্য করতে পারছি না।' ফোন পাওয়া মাত্র ড্রিম-হেভেনের পিক-আপ ভ্যান চলে আসে। এরপর তমোনাশবাবু চলে যায় নার্সিং-হোমে। দামি কেবিনে তাকে শোয়ানো হয়। ডাক্তাররা আসেন। ডাক্তারদের মুখে কেঁদে কেঁদে বলেন। ---আমারসারাজীবনের ক্যাপিটেল মানবিক মারা গেছে। এখন চলবে কিসে ? ডাক্তাররা তাকে আশ্বাস দিয়ে অপারেশন মেনিয়ে যান এবং খুবই দক্ষতার সঙ্গে মৃত মানবিকতাকে সরিয়ে দিয়ে বুকে পেসমেকার বসাবার মতো নকল মানবিকতাকে তমোনাশবাবুর বুকে বসিয়ে দিয়ে বলেন---'ও-কে, দুদিন এখানে বিশ্রাম নিন। আমাদের ওয়াচে থাকুন। আপনার মাথায় আবার হিউম্যানিস্টিক স্ট্রাগলিং প্লট আসে কিনা আমাদের ওয়াচ্ করতে হবে।'

কিন্তু নার্সিং -হোমের দামি কেবিনেও অমোনাশবাবুর ভাল ঘুম হয় না। চোখ বুজলেই দেখতে পান 'গতি' খোঁড়াতেখোঁড়াতে তমোন াশবাবুর মস্তিষ্কের কোষে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। 'প্র' খসে যাওয়ার পর থেকে 'গতি' তার গতি হারিয়ে ফেলেছে। 'মানবিক' মারা যাওয়ার পর 'গতি' আঘাত হানে তমোনাশবাবুর মস্তিষ্কে। প্রথমত, সুখের ঘুমকেড়ে নেয়। দ্বিতীয়ত, অশ্লীল চিন্তা ভাবনা মনের মধ্যে য াওয়া আসা করে। তৃতীয়ত, পাইপে ও মদে (খুব গোপনে নারীতেও) আসক্তি বাড়িয়ে তোলে। সংবর্ধনায় প্রগতি ও প্রগতিশীল শুনতে শুনতে তমোনাশবাবুর এত বিরক্তি দেখা দিয়েছিল যে তিনি এখন 'প্রগতি'র হাত থেকে বাঁচতে চাইছেন। আর 'প্র' অক্ষর খসে যাওয়াতে তমোনাশবাবুখানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কারণ জীবনের গতিও আগের মতো নেই। তিনি যাট পেরিয়ে গেছেন। তবু গতিএখন জোঁকের মতো মস্তিষ্ক কামড়ে থাকে। তখনই হয় আজকের সংবর্ধনা সভা হয়তো তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতিকে বন্ধকরতে

চেয়েছিল। তিনি ছটফট করেন। তাঁর ছটফটানি দেখে নার্স এবং হেডনার্স ছুটে আসেন। তাদেরকে দেখে তিনি কেঁদে ফেলেন। বলেন 'আমি বাড়ি যাব।'

তিনি ঘুম থেকে ফিরে এসে দেখেন লোডসেডিং তখনও চলছে। একটু পরে ব্যাটারি চালিত নিয়ন আলোটা জ্বলে ওঠে। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানীয় পান করেন চোখ বুজে। মৃত 'মানবিক' এবং লুকোনো 'প্রগতি' দুটোকে তিনি এখন আর পছন্দ করছেন না। শব্দ দুটো ক্রমাগত যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি প্রশস্তি - পত্র থেকে অন্য শব্দ খোঁজেন যে শব্দ তাঁকে সান্ত্বনা দেবে, সুখ দেবে, আনন্দ দেবে। খুঁজতে খুঁজতে 'দয়ালু' নামক একটা শব্দ পেয়েও যান। 'দয়ালু' শব্দটা বার বার উচচারিত হয়েছে এই প্রশস্তি - পত্রে। দয়ার সাথে আলু প্রত্যয় দয়ালু। অথচ আলু খাওয়া ডাক্তারের বারণ। এই বয়সে সুগার চেক করাতে হয়। আলু মাইনাস্ দয়া মানে অনুকম্পা। বার্ধক্যের কাছাকাছি চলে আসা কৃপা বা কণা তিনি আর কুড়োতে চান না। তিনি এখন 'দয়া' থেকে 'য়া'-টা মাইনাস করেছেন। কারণ তার মধ্যে দয়া-মায়ার ছিটেফোঁটা আর অবশিষ্ট নেই। খ্যাতির মোহ তমোনাশবাবুকে ছেলে - মেয়ে -স্ত্রীর কাছ থেকে অনেক দূর সরিয়ে নিয়ে গেছে। আসলে 'দ' বর্ণটাকে পছন্দ করছেন। 'দ' একাই তমোনাশবাবুর বুক চিরে জল বার তমোনাশবাবু এখন করে আনে। 'দ' অর্থাৎ বুকে দহের সৃষ্টি হয়। তারপর দহের স্রোতে লেখার ভেলায় চেপে খ্যাতির দেশে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে কি ? পারে না। 'দ' অর্থাৎ দোয়াড়ির মতো বুকের পাঁজরে আটকে যায়। আর তখনি তমোনাশবাবু বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন মুখে একরকম গোঙানির শব্দ। ঘরে কেউ নেই। প্রৌঢ়াকাজের মেয়েটাও চলে গেছে। তিনি একা। ক্রমশ ক্রমশ প্রশস্তি - পত্রের প্রশস্তি ও 'প্রগতিশীল কথা সাহিত্যিক তমোনাশ চক্রবর্তী সৃষ্ট দয়ালু এবং মানবিক চরিত্রগুলো বাঙলা কথা সাহিত্যে চির মানবিক, দয়ালু ঐ সব একগুচ্ছ শব্দ, তমোনাশবাবুর চারতলার ফ্ল্যাট থেকে নেমে মানপত্র থেকে বেরিয়ে এসে চারতলায় ফ্ল্যাটের তলার চার পাশে যে সব বস্তি আছে সেখানকার বেড়ার ফোঁকোর দিয়ে ঢুকে পড়ছে। একদা সংগ্রামী লেখক তমোনাশবাবু' আদর্শবাদের পাছায় লাথি মেরে অর্থে যশে বিরাট হওয়ার সুযোগ সুবিধা নিয়ে চারতলার ফ্ল্যাটে উঠে এসেছেন, যে চারতলার ফ্ল্যাটের আধুনিক ব্যালকনি থেকে তিনি অনেক সময় নোটের ভেতর কয়েন ভরে ছুঁড়ে দিয়েছেন খরাত্রানে, বন্যাত্রানে, ভূমিকম্পে বিধবস্ত নিরন্ন মানুষদের উদ্দেশে। সেই জনবিচ্ছিন্ন শব্দগুলো নিচে এসে ফের লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হয়।

বুকের যন্ত্রণায় তমোনাশবাবুর ঘাড় কাত হয়ে যায়। এক মাথা কাঁচাপাকা চুল চোখ মুখের অর্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে যেন ঝড়ের দাপটে ঐ রকম অবস্থা। আস্তে আস্তে তমোনাশবাবুর উজ্জ্বল চোখ দুটো বুজে আসে শব্দের ভীড়ে। এমনি সময়ে ফোন বেজে ওঠে। একবার তিনি চেষ্টা করেন বোজা চোখটা খুলে হাতটা বাড়িয়ে ফোনটা ধরতে পারেন না। ডান হাতটা অবশ হয়ে আসছে। তারপর হঠাৎ হাতটা খাটের পাশে ঝুলে পড়ে ঝুলতে থাকে। অথচ তিনি জানেন ফোন টা কে করেছে । তমোনাশবাবু একমাত্র মেয়ে 'লেফট্- উইঙ্গ' নাট্য-সংস্থার পরিচালিকা নিয়মিত রাত দশটায় বাবাকে ফোন করে অধ্যাপিকা মা'য়ের ফ্ল্যাট থেকে।
সেই ফোন বেজেই চলছে।